বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.009

জাকির তালুকদারের ছোটগল্প : ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিম্নবর্গীয় বাস্তবতা

মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষ ঔপনিবেশিক ও নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে প্রান্তিক ও নিম্নবর্গের বাস্তবতায় পতিত হয়েছে। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর এমন বাস্তবতা পাওয়া যায় জাকির তালুকদারের 'রাজার বাড়ি', 'পণ্যায়নের ইতিকথা', 'স্বজাতি', 'আতশ পাখি', 'কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই', 'টানাবাবা' প্রভৃতি গল্পে। অর্থ ও ক্ষমতার বাইরে থাকা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষদের ওপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চিত্রসহ শোষণ-নির্যাতনের পটভূমিতে রচিত এই গল্পসমূহ বুর্জোয়া চেতনা বিরোধী উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবধারা পুষ্ট। দলিত শ্রেণির ঐতিহাসিক ও বাস্তব জীবনরে অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ এই গল্পগুলো ' সাব-অল্টার্ন স্টাডিজে'র গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। পাঠ-বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে এই গল্পসমূহে প্রতিফলিত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিম্নবর্গীয় বাস্তবতা অনুসন্ধান করাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান বিষয়।

চাবি শব্দ: ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী, সাব-অল্টার্ন পরিস্থিতি, ছোটগল্প, নিম্নবর্গীয় বাস্তবতা।

বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় সাংবিধানিক নীতি বা আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রাখলেও এখানে বসবাসরত সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরাসহ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর অনগ্রসর মানুষ আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে জটিল এক পরিস্থিতি বয়ে বেড়াচ্ছে। ঔপনিবেশিক সময় থেকে বুর্জোয়া আধিপত্যবাদের শিকার হয়ে তারা নিজস্ব সংস্কৃতি (পরিচয়ের জমিন) থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাশাপাশি ভূমি থেকে উৎখাত, অর্থনৈতিক শোষণসহ শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছে।[১] স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোতে একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক ভাবধারা বিদ্যমান তেমনই বিশ্বায়ন, প্রযুক্তির বিকাশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন পরবর্তী পুঁজিবাদের উত্থানের মাধ্যমে নব্বইয়ের দশক হতে নব্য-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি চালু হয়। নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণের সূত্র ধরে বর্তমান সমাজের মূলস্রোতের বাইরে থাকা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা 'নিম্নবর্গের ভিতরে নিম্নবর্গ' হিসেবে বিবেচ্য হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের ছোটগল্পে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতি নতুন নয়। আবু বকর সিদ্দিক (১৯৩৪-২০২৩), আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯), বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-২০২০), হাসনাত আবদুল হাই (১৯৩৭), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১), রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০১৯), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭)-সহ অনেক লেখক ছোটগল্পের ক্যানভাসে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর জীবন-চিত্র বিনির্মাণের চেষ্টা করেছেন। তবে নিম্নবর্গ বাঙালির বিপরীতে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীকে 'নিম্নবর্গের ভিতরে আরও

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

নিম্নবর্গ' বা Double Colonised হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে মূলত নব্বইয়ের দশক ও পরবর্তী সময়ের গল্পে। নব্য-ঔপনিবেশিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নব্বইয়ের দশকের গল্পকারগণ, বিশেষভাবে– শাহাদুজ্জামান (১৯৬০), শাহীন আখতার (১৯৬২), আকমল হোসেন নিপু (১৯৬২), সাদ কামালী (১৯৬২), ইমতিয়ার শামীম (১৯৬৫), জাকির তালুকদার (১৯৬৫), শাহনাজ মুন্নী (১৯৬৯), প্রশান্ত মৃধা (১৯৭১), অদিতি ফাল্গুনী (১৯৭৪) প্রমুখ গল্প রচনা করেন। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর জীবন ও বাস্তবতা নিয়ে জাকির তালুকদার সর্বাধিক গল্প রচনা করেন।

জাকির তালুকদার বাংলাদেশের প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক যিনি ১৯৬৫ সালের ২০ জানুয়ারি নাটোর জেলার আলাইপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন চিকিৎসক হয়েও উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধসহ অন্যান্য সাহিত্য রচনার মাধ্যমে মানবিক দায়বদ্ধতা ও অগ্রগামী চিন্তার সাক্ষর রেখেছেন। *স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তু পুরাণ* (১৯৯৭), *বিশ্বাসের আগুন* (২০০০), *কন্যা ও জলকন্যা* (২০০৩), *কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই* (২০০৬), *হা–ভাতভূমি* (২০০৬), *মাতৃহন্তা ও অন্যান্য গল্প* (২০০৭)-সহ তাঁর অনেক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই গ্রন্থসমূহের অধিভুক্ত 'রাজার বাড়ি', 'পণ্যায়নের ইতিকথা', 'আতশ পাখি', 'কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই', 'টানাবাবা', 'স্বজাতি' প্রভৃতি গল্পে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিম্নবর্গীয় জীবন ও বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। মূলত এই গল্পগুলোতে প্রতিফলিত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষের জীবন ও সমাজের নিম্নবর্গীয় বাস্তবতা, ঐতিহ্য-সংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তরসহ তাদের মুক্তির সংগ্রামের চিত্র 'সাব-অল্টার্ন স্টাডিজে'র আলোকে বিশ্লেষণ করার অপেক্ষা রাখে।

দুই

প্রচলিত ইতিহাসে শাসকশ্রেণি বা উচ্চবিত্তের প্রভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি আরোপিত থাকে বলে নিম্নবর্গের প্রকৃত ইতিহাস তুলে আনতে বিশশতকের আশির দশক হতে 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা'র (Subaltern Studies) ধারা গড়ে উঠেছে। এই ধারার মূল প্রবক্তা ইতালির দার্শনিক আন্তনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭), যিনি নিম্নবর্গের পরিচয় তুলে ধরতে ইংরেজি 'সাব-অল্টার্ন' (Subaltern) শব্দের ব্যবহার করেন। 'সাব-অল্টার্ন' শব্দটি প্রথম সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত হতো, যার আভিধানিক অর্থ 'অধস্তন'। গ্রামসির মতে, ক্ষমতার বিন্যাস অনুযায়ী প্রভুত্বের অধিকারীদের অধীনে যারা শাসিত ও নির্যাতিত হয়ে থাকে তারাই সাবলর্টান। 'সাব-অল্টার্ন' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে রণজিৎ গুহ বাংলায় প্রথম 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেন।[২] সাব-অল্টার্ন স্টাডিজের ধারণা ও কার্যাবলি এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে মার্কসীয় 'শ্রেণি-সংগ্রাম' তত্ত্ব। এই তত্ত্ব মতে, নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারা সমপর্যায়ের মানুষের মধ্যে উদ্ভূত গোষ্ঠীকে শ্রেণি বলা হয়। প্রাচীন সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমাজ বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম বিদ্যমান, যেখানে এক শ্রেণি আরেক শ্রেণির ওপরে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে।[৩] শ্রেণি-সংগ্রাম তত্ত্বের প্রবক্তা দার্শনিক কাল মার্কস মনে করেন, মানবজাতির ক্রমোন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে 'যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস'[৪] বা পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ইতিহাস। তিনি আরও মনে করেন– উৎপাদনের মূল চালিকা-শক্তি হচ্ছে শ্রম, আর

শ্রমিকের শ্রম থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত মালিক আত্মসাৎ করে আর শ্রমিক তার যথার্থ মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এই ব্যাপারে শ্রমিক যখন সচেতন হয় তখনই দুয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিকেরা শ্রেণি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।[৫] শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমেই এক সময় নিম্নবর্গ শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেণি-সংগ্রাম তত্ত্ব শ্রমিক ও মালিকের বিভাজনকে সুস্পষ্ট করলেও সাব-অল্টার্নিজমে নিম্নবর্গ হিসেবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ কর্মক্ষেত্রের সকল অধস্তনের প্রতি ইঙ্গিত করে। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে যারা শ্রমিক দ্বারা পরিবার ও সমাজে শোষিত ও নির্যাতিত (নারী বা উপার্জনহীন অক্ষম) তারাও সাব-অল্টার্ন বা নিম্নবর্গ হিসেবে বিবেচ্য।

সর্বোপরি সাব-অল্টার্ন জনগোষ্ঠীর পরিসর অত্যন্ত বৃহত্তর হলেও মার্কসীয় শ্রেণিবিভক্ত সমাজের নিম্নবর্গ জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক জড়িত। বাংলাদেশে অর্থ ও ক্ষমতার শাসনকে কেন্দ্র করে উচ্চবর্গ বনাম নিম্নবর্গের যে সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে সেখানে অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য সর্বহারা, হরিজন ও দলিতদের নিম্নবর্গ হিসেবে দেখা যায়। অর্থ ও ক্ষমতার শাসন টিকিয়ে রাখতে উচ্চবর্গ যেভাবে তাদের ওপরে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আরোপসহ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, সেই কৌশলকে সাব-অল্টার্ন স্টাডিজের প্রবক্তাগণ সাহিত্যে অনুসন্ধান ও উপস্থাপন করতে আগ্রহী। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষ নিম্নবর্গ হিসেবে কতটা অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য তার একটা পাঠ জাকির তালুকদারের গল্প হতে পাওয়া যাবে। তাছাড়া উচ্চবর্গ দ্বারা তারা কীভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে তার পরিচয়ও তাঁর গল্পে অনুসন্ধান যোগ্য।

সাম্প্রতিক সময়ের প্রথিতযশা গল্পকার জাকির তালুকদার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর বাস্তবতা নিয়ে রচিত গল্পে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ বিনির্মাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করেছেন। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর বহুসংকটের অন্যতম তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখা। উপনিবেশিতের ওপরে সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের একটি প্রকল্প। সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক শক্তি বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রচার চালিয়েছে। ঔপনিবেশিক সময় থেকে তারা চিকিৎসা ও সাহায্যের নামে বাঙালিসহ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ওপরে খ্রিষ্টধর্ম আরোপ করে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় হারা করতে চেয়েছে। উল্লেখ্য যে–

> ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যের অনুষঙ্গ হিসেবে মিশনারিদের কার্যক্রমকে ভারতবর্ষে উৎসাহিত করে। বলা হতো: কোনো ইন্ডিয়ান যদি খ্রিস্টধর্ম বিবর্জিত থাকে তার জন্য স্বাধীনতা অনুপযুক্ত। [...] মিশনারিদের কার্যক্রম মুসলমানদের দ্বারা বাধার আশঙ্কা ছিল। কিছু ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেছেও। তারপরও দলিত শ্রেণী ও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর অনেককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে তারা সমর্থ হয়েছে।[৬]

উদ্ধৃতির আলোকে এবং বাংলাদেশের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা যায়, ঔপনিবেশিক শক্তি বাঙালিদের অল্পপরিমাণে খিষ্টধর্মের পরিণত করতে সক্ষম হলেও ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অনেকটা সফল হয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বধারা অনুসারে– বুর্জোয়া সভ্যতা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে নিম্নবর্গকে প্রান্তিক ও অধীন করে রাখে, তেমনই অর্থনৈতিক শোষণের কাজ ত্বরান্বিত করতে নিম্নবর্গের সংস্কৃতিকে প্রান্তিক দাবি করে নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে

উপস্থাপন করে।[৭] বুর্জোয়াদের আধিপত্যবাদী কর্মকাণ্ডে নির্যাতিত নিম্নবর্গ জনগোষ্ঠী দুর্বল অর্থনীতি ও হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতি ছেড়ে বুর্জোয়াদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য। ঔপনিবেশিকদের রেখে যাওয়া বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামো ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ওপরে এখনও যেমন আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর রয়েছে তেমনই তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

জাকির তালুকদার রচিত 'রাজার বাড়ি' গল্পে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় হারানোর চিত্র পাওয়া যায়। এই গল্পটি বিশ্লেষণের পূর্বে একই সময়ে একই ভাবধারায় রচিত অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় হারানোর' পটভূমিতে লেখা অদিতি ফাল্গুনীর 'ব্রিংনি বিবাল' গল্প প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। এই গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে ময়মনসিংহ-মধুপুর অঞ্চলে বসবাসরত মান্দিদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও বিশ্বাসসহ বর্তমান বাস্তবতা ঘিরে। সেখানে সুররিয়ালিস্ট চৈতন্যের গতিপ্রকৃতি ও কল্পবাস্তব ভাবনার আবেশে মান্দিদের আদি ইতিহাস, তাদের বিশ্বাসে জড়িয়ে থাকা দেবদেবী, ধর্মবোধ, লোকশ্রুতি, প্রকৃতি নির্ভরতাসহ সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়। গল্পে গল্পকার প্রাবন্ধিকসত্তা দিয়ে উপস্থাপন করেন– প্রাচীন 'সাংসারেক' ধর্মের অধিভুক্ত 'আচেক' মান্দিরা প্রায় হাজার বছর আগে চীনের কিদিও অঞ্চল হতে আসাম, মধুপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল পাহাড়ি এলাকায় এসে বসতি গড়ে। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ হতে মান্দিদের ভেতরে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার হতে থাকে। মান্দিদের ধর্মীয় রূপান্তরের প্রয়োজনে পাদ্রিরা প্রথমত তাদের সংস্কৃতি ও দেবদেবীদের নিজেদের সাথে আত্মীকরণ করে। প্রসঙ্গত পাদ্রির নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য–

> মান্দি জাতি! তোমরা স্মরণ হও সেই পূতচরিত্র ফাদারদের কথা, যাহারা শত দুঃখ-কষ্ট সহিয়া মধুপুরের শালবন হইতে মেঘালয় পর্যন্ত মান্দি আদিবাসীদের ভেতর খ্রিস্টধর্মের অগ্নিশিখা প্রজ্জলন করিয়াছেন। ইতিহাসে সর্বদাই দেখা গিয়াছে, পরম পিতা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্যচারী আদিবাসী গোষ্ঠীদের ভেতরেই পাঠাইয়াছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাজক ও মারিয়াদের। [...] ইদানিং কোনো কোনো বাতুল যুবা প্রশ্ন করেন, খ্রিস্টান হইবার কারণে আমরা আমাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ভুলিতে বসিয়াছি তাহার কী হইবে? [...] জবাব দিতে আমি আমাদের প্রাচীন শস্য উৎসব "ওয়ানগালা" উপলক্ষে স্বহস্তে কিছু গান রচনা করিয়াছি। [...] কোথাও প্রাচীন উৎসবের সাথে খ্রিস্টের বন্দনা জুড়িয়া দিয়াছি, কোথাও-বা যে সকল গানে আদি পৌত্তলিক দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তব রহিয়াছে, সেইখানে দেবতার স্থলে 'শয়তান' শব্দটি বসাইয়া দিয়াছি।[৮]

এভাবে মান্দিদের দুর্বলতা, রোগ-ব্যাধি ও দারিদ্র্যকে কেন্দ্র করে পাদ্রিরা কৌশলে আত্মীকরণের নামে তাদের ধর্মান্তরিত করে খ্রিষ্টান বানিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতে স্থিত মান্দি জাতির ৯৫% খ্রিষ্টান, বাকি ৫% মাত্র তাদের প্রাচীন 'সাংসারেক' ধর্ম অবলম্বন করে আছে।[৯] আরও দেখা যায়, প্রকৃতির সাথে বসবাসকারী মান্দিরা তাদের নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি হারিয়ে নিম্নবর্গ প্রান্তিক জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছে। ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় শাসনের পটভূমিতে মান্দিসহ অন্যান্য নৃগোষ্ঠী যেমন উপনিবেশিত ছিল, তেমনই উপনিবেশ পরবর্তী পাকিস্তান পর্বেও তারা অবদমিত, উপেক্ষিত এবং শোষিত হয়ে আসছে। স্বাধীন বাংলাদেশে তারা বাঙালিদের তুলনায় প্রান্তিক ও অবদমিত হয়ে নিম্নতর জীবনধারায় বাধ্য হচ্ছে। গল্পের শেষপর্বে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে জায়গা পেয়েছে মুক্তিযোদ্ধা প্রবীর চিরাণ মান্দি এবং তার কন্যা সালনিমা। চিরাণ মান্দি উন্মাদ অবস্থায় গলায় লাল অক্ষরে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ভিক্ষা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য –

প্রবীর চিরাণের গোটা পরিবারটাই ছিল শাপগ্রস্ত। প্রবীর চিরাণের খুব সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল, যার হবু বর সিমসাং থেকে বিপাং টানতে যেয়ে আর ফিরে আসেনি। মেয়েটি পরে ঢাকায় চলে যায়, সেখানে সে পার্লারে চুল কাটে। আর প্রবীরের বউ...কে আর এত খোঁজ রাখে, আজকাল মান্দিদের জীবনও তো অনেকটা বাঙালিদের মতো ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে [...] সম্ভবত মেঘালয় চলে গেছে, কোনো আত্মীয়ের বাড়ি? [১০]

মান্দিদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মৃত্যু শুরু হয় মূলত ঔপনিবেশিক সময় হতে। গল্পে সালনিমার দুঃখ-যন্ত্রণার কাহিনির মাধ্যমে পুরো মান্দি জাতির বর্তমান করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে মান্দিরা ধর্ম-সংস্কৃতি ও পেশা হারিয়ে অনেকে দিনমজুর খাটে, অনেকে নগরমুখী হতে বাধ্য হয় এবং কাউকে কাউকে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়। মান্দিদের সংস্কৃতি হরণ ও শোষণের ভূমিকায় উচ্চবর্গ হিসেবে ঔপনিবেশিক শক্তির পাশাপাশি বর্তমান বাঙালি জাতিকেও গল্পে পাওয়া যায়। অদিতি ফাল্গুনীর 'ব্রিংনি বিবাল' গল্পে প্রতিফলিত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী মান্দিদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারানোর এমন চিত্র জাকির তালুকদারের 'রাজার বাড়ি' গল্পের ভূমিকা হিসেবে চিন্তা করা যায়। সমাজের মূল স্রোতের বাইরে থাকা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত 'রাজার বাড়ি' গল্পটি ঐতিহাসিক একটি গল্প। ইতিহাসের পাঠ থেকে জানা যায়– সমতলভূমিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র-জাতি সাঁওতাল এবং ওঁরাওরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার্থে ভাসমান জাতি হিসেবে নিজেদের ভাগ্য মেনে নিয়েছে। তাদের প্রধান পেশা ছিল কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক পেশা ঘিরেই তাদের লোকজ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। লোকশ্রুতি আছে– সাঁওতালরা হিহিড়ী, পিপীড়ি ও হারাতা পর্বত পেরিয়ে আয়রে দেশ, কায়রে দেশ ও চাঁই দেশে আশ্রয় নিয়েছে।[১১] প্রশ্ন হচ্ছে– যাদের প্রধান পেশা কৃষি তারা কি সহজে দেশ ত্যাগ করে এখানে এসেছিল! তা অবশ্যই হতে পারে না। সাঁওতালরা মূলত স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ। তাই তারা বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তবুও কারো দাসত্ব মেনে নেয়নি।[১২] এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মালপাহাড়ি ও মুণ্ডাদের ঘনিষ্ঠ জনতাত্ত্বিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

১৮৫৫-১৮৫৬ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাঁওতালরা নওগাঁ ছেড়ে মালদহে চলে যায়। পরে বুর্জোয়া জোতদারদের প্রয়োজনে ফিরে এলেও জমির মালিকানা হারিয়ে ভূমিহীন শোষিত শ্রেণিতে পরিণত হয়। সাঁওতাল বা ওঁরাওরা বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতেও যেভাবে উপনিবেশিত হয়ে আসছে এবং বুর্জোয়া শোষণব্যবস্থা তাদের ওপর যেভাবে বিদ্যমান রয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'রাজার বাড়ি' গল্পের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে–

ওঁরাওদের নিজ দেশ ছেড়ে এদেশে আসা পর্যন্ত ইতিহাসের সঙ্গে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ– এই সময়পর্বের জীবন-বৃত্তান্ত, বর্ণনার ভিতর দিয়ে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্তু সকল পর্বেই তাদের দুঃখ কষ্ট বেড়েছে বৈ কমে নি। চেষ্টার কমতি ছিল না ওঁরাওদের। কিন্তু পাহাড়-জঙ্গলের সরল জীবনকে বারবার তছনছ করেছে সমতলের জটিল প্রভুরা।[১৩]

জাকির তালুকদার তাঁর এই গল্পে সাঁওতাল এবং ওঁরাওদের প্রায় অভিন্ন করে আঁকলেও ওঁরাওদের স্বতন্ত্র ভাষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। তারা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে যুগযুগ ধরে রাজশাহী বিভাগ ও তার আশেপাশে বিস্তৃত বন-জঙ্গল ও জলাভূমি অঞ্চলে বসবাস করে। প্রকৃতির সাথে তাদের জীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বনের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে তাদের বসবাস

আর বনমুরগী দিয়ে তারা 'ফাগুয়া' পার্বণ উৎযাপন করে। লাকড়া, তিগগ্যা, বিন্ডো, এক্কা, টপ্য, ক্ষেস, খাঁখাঁসহ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ওঁরাওদের ঐক্যবদ্ধ চেতনা দৃঢ়মূল রাখতে দেবতা তাদের নিজ গোত্রে বিয়ে-সাদি বারণ করেছে। তাদের জীবন কাটে অতি সারল্যে ভরা বিশ্বাস ও আন্তরিক মূল্যবোধ নিয়ে। তাছাড়া তাদের সংস্কৃতি জুড়ে আছে নানা রকম লোককাহিনি, বিশ্বাস ও দেশপ্রেম। কিন্তু ঔপনিবেশিক কৌশলে রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে তৎপর। তাদের ওপরে নির্যাতন শুরুর বিষয়ে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি লক্ষ করা যেতে পারে–

> প্রথম প্রথম এসে আলগোছে তাদের বসতির এক কোণে বসত গড়ত এক এক ঘর মানুষ। তারা তখন খুশিই হতো। একঘর প্রতিবেশী তো বাড়ল। কিন্তু দেখা গেল তারা বড় নাক উঁচু মানুষ। ওঁরাওদের সাথে মিল-মহব্বত তো দূরের কথা তাদের মানুষ বলেই গণ্য করে না। তারা খাবলা বসায় ওঁরাওদের জমিনে। রাজার লোক, রাজার সেপাই তাদের পক্ষেই সবসময় কথা বলে।[১৪]

এভাবে রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ ও বাঙালি জনগোষ্ঠী আদিবাসীদের ভূমি কেড়ে নিয়েছে এবং ওঁরাওদের সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ওঁরাওদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ঢোলক-মাদল ও নাচ-গানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় এই মোহাজেররা হামলা চালিয়ে ছাদনাতলা, মঙ্গলঘট, সিঁদুর, শঙ্ক, আতপ চাল, ধান-দুর্বা সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। আর পুলিশ এসে কোমরে দড়ি বেঁধে তাদের মধ্য থেকে রত্নেশ্বর, রঘুনাথ, শান্তিয়াসহ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। ভিটেটুকু ছাড়া ওঁরাওদের যখন আর চাষের জমিও থাকে না তখন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়ক ফাদার-সিস্টাররাও নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে গল্পের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য–

> ত্রাণকর্তা হিসেবে ফাদার-সিস্টাররা আসে। দুধের কৌটা নিয়ে, ফলের রস নিয়ে, কাটা ঘাঁয়ের ওষুধ নিয়ে আর প্রভু যীশুর সুসমাচার নিয়ে। দোয়াতপাড়ায় নারদ নদের ধারে মিশন তৈরি হয়, গির্জার চূড়া দেখা যায়। সময়কে টুকরো টুকরো করে গির্জার ঘন্টা বাজে। আর হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায় সুনীল বিন্ডো হয়ে যাচ্ছে সুনীল রোজারিও, নরেশ কিসপট্টা হয়ে যাচ্ছে নরেশ বেনজামিন, তরুদাসী খালকো হয়ে যাচ্ছে তরু মার্টিনা রোজারিও। তাদের কেউ গির্জার হাসপাতালের নার্স হয়, কম্পাউন্ডার হয়, কেউ কেউ গির্জার ব্যবস্থাপনায় দর্জিবিদ্যা শিখে আসে। বিদেশি টাকায় ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে দোকান খুলে বসে।[১৫]

ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় শক্তি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনৈতিক সংকটকে পুঁজি করে তাদের চিকিৎসা ও খাদ্য সহায়তার নামে নিজেদের ধর্মীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে নির্যাতিতদের সহায়তার নামে ধর্মান্তরিত করা বা তাদের সংস্কৃতিকে আত্মীকরণের পাশাপাশি পশ্চিমারা নিজেদের উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগের জন্য যে ক্ষুদ্র-ঋণের ব্যবস্থা করে সেই ঋণের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে দরিদ্র ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে দরিদ্র হতে থাকে। মূলত ওঁরাওদের বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত 'রাজার বাড়ি' গল্পটি ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবের (১৯৩০-২০১৩) *থিংস ফল এপার্ট* (১৯৫৮) উপন্যাসের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে আছে। আফ্রিকান ইবো গোত্রের ঐতিহ্য এবং তা ধ্বংসের মতো ঘটনা এই গল্পের কাহিনিতে থাকা ওঁরাওদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

সর্বোপরি বাংলাদেশের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কাঠামোতে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া ভাবধারা বিদ্যমান থাকায় ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ওপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য ক্রিয়াশীল রয়েছে। তাছাড়া গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক হতে বুর্জোয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিশ্বায়নের প্রভাবে তারা যেমন বিশ্বনাগরিকে পরিণত হচ্ছে তেমনই তাদের সংস্কৃতির রূপান্তর ত্বরান্বিত হচ্ছে। তাদের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের বাস্তবতায় রচিত বাংলাদেশের ছোটগল্প সম্পূর্ণত সাব-অল্টার্ন স্টাডিজের ধারার সাথে অন্বয়সম্পৃক্ত এমন দাবি করা অযৌক্তিক নয়।

তিন

অর্থ ও ক্ষমতার বাইরে প্রান্তিক জীবনধারায় অভ্যস্ত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষ ঔপনিবেশিক সময় হতে বর্তমান বিশ্বায়ন ও পুঁজিবাদের যুগ অবধি শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'এক্সক্লুডেড এরিয়া' দাবি করে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই লেকে বাঁধ নির্মাণ করে পার্বত্যবাসীর ৪০% বসতি ও জুমচাষের জমি পানির নিচে ডুবিয়ে দিয়েছে। ১৯৭০-র দশকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে হাজার হাজার বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসিয়ে আদিবাসী-বৈরী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার নীলনকশা বাস্তবায়ন করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য–

> স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের শুরুতেই 'জাতি'র ধারণাকে একচ্ছত্রভাবে 'বাঙালি' পরিচয়ের সাথে বেঁধে ফেলাটাকেই স্বাভাবিক মনে করেছিলেন নবীন রাষ্ট্রের স্থপতিরা। বাংলা অঞ্চল যে বরাবরই বহুজাতির দেশ ছিল এবং সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশও যে এর ব্যতিক্রম ছিল না– এই উপলব্ধি হারিয়ে যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতে।[১৬]

এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম করে আসছে। সাংবিধানিকভাবে আদিবাসী শব্দ ব্যবহার, পৃথক ভূমি কমিশন, নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন তাদের প্রাণের দাবি। উল্লেখ্য ২০১১ সালে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ৩২ (ক) ধারা সংযোজন করে আদিবাসী শব্দের পারিবর্তে ক্ষুদ্র-জাতিসত্তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নকল্পে সরকারি চাকরিতে কোটা সংরক্ষণ ও তাদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দৃষ্টি প্রদান সত্ত্বেও তারা নিম্নবর্গের মধ্যে নিম্নবর্গ হিসেবে বিবেচ্য। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ইতিহাসের পাতায় অধস্তন হিসেবে উচ্চবর্গ রাষ্ট্রশক্তি, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিসহ বৃহত্তর বাঙালি জাতি দ্বারা যেভাবে নির্যাতিত, শোষিত ও অবদমিত হয়ে থাকে তার প্রকৃত স্বরূপ উপস্থাপন করা দুঃসাহসিক কাজ। জাকির তালুকদার সাহিত্যে তাদের জীবনায়ন ঘটিয়ে শিল্পের সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় রেখেছেন।

নিম্নবর্গ হিসেবে পাহাড়ি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর তুলনায় হাওর, উপকূল ও বরেন্দ্রভূমি ও অন্যান্য সমতলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা অধিক বঞ্চিত বলে অধ্যাপক আবুল বারাকাত তাঁর এক গবেষণায় মতামত প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন– ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট-বরাদ্দে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ১১ হাজার ২৭০ টাকা, আর পাহাড়ে মাথাপিছু বরাদ্ধ ১৬ হাজার ৭২৪ টাকা।[১৭] তাছাড়া সমতলের ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীর জন্য আলাদা কোনো মন্ত্রণালয় নেই, তাদের অনেককে ধর্মান্তরের মাধ্যমে হিন্দুত্ব গ্রহণ করানোর চেষ্টাসহ হিন্দু বলে

তাদের জমি দখল করে নেয়া হচ্ছে। জমি বেদখলসহ পানি-সংকটের কারণে তারা দরিদ্র কৃষক হিসেবেও বেঁচে থাকতে পারছে না।[১৮] সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর এই রকম বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত জাকির তালুকদার রচিত 'পণ্যায়নের ইতিকথা' গল্পটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক শক্তির কাছে সাঁওতালরা কতটা নির্যাতিত ও প্রান্তিক তার পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পে। গল্পে স্থানীয় এমপির ক্ষমতার জোরে মোজাম্মেল চেয়ারম্যান দরিদ্র সাঁওতালদের পুঁজি করে নিজেদের সম্পদের পাহাড় তৈরি করে। টিকা দান, ক্ষুদ্র-ঋণসহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বিদেশি অনুদানের অর্থ নিজেরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলেও সাঁওতালদের কোনো পরিবর্তন হয় না। তারা জোরপূর্বক সমস্ত সম্পত্তি দখলে নিয়ে সাঁওতালদের নিজস্ব ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে। তাদের সাথে মিলে বাঙালি সাধারণ জনগোষ্ঠীও নির্যাতন চালায়। গল্পের একটি স্থানে তাদের মমকথা বিধৃত হয়েছে এভাবে :

> সাহেব, আমরা যে কয়দিন বেঁচে থাকি, চোঁয়ানিই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। জমি কেড়ে নেয় বাবুরা। রিলিফের চাল কেড়ে নেয়। মঙ্গার খয়রাত কেড়ে নেয়। আঙুলের টিপছাপ নিয়ে ভাগিয়ে দেয় আমাদের। পেটের খিদে নিয়ে কোথায় যাই? তখন চোয়ানি। ও-তো ভাতেরই জিনিস। ভাতও খাওয়া হলো, দুঃখ ভোলার নেশাটুকুও হলো। শুধু কি আমরাই খাই? বাচ্চাগুলো যখন খিদের জ্বালায় ট্যাঁ, ট্যাঁ করে কাঁদে, তখন চোয়ানিতে আঙুল ডুবিয়ে সেই আঙুল চোষাই বাচ্চাদের। তবেই না বাচ্চারা শান্ত হয়ে ঘুমাতে পারে।[১৯]

উদ্ধৃতিটির মধ্যে সম্বলহীন অসহায় মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন ও ভবিষ্যতের ভাবনার নিরুদ্বেগ এক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। জীবনের সম্ভাবনায় মানুষ যখন বেঁচে থাকার মৌলিক উপকরণ খাদ্যের নিশ্চয়তাও নিশ্চিত করতে ব্যর্থ, তখন তারা শূন্যতায় ডুবে যায়। দুই-একজন সুবিধাভোগী ছাড়া পুরো সাঁওতাল জনগোষ্ঠী মূলত অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। বুর্জোয়া সভ্যতার দালাল হিসেবে সত্য মেম্বারের মতো যে দুই-একজন সাঁওতাল পরিবারের অবস্থার পরিবর্তন হয় তারা নিজেদের সাঁওতাল পরিচয় নিয়ে হীনম্মন্যতাবোধে আক্রান্ত থাকে। জাকির তালুকদারের 'স্বজাতি' গল্পেও দেখা যায়, বাঙালিরা সাঁওতাল নারী-শিশুকে ধর্ষণ করে। স্বজাতির চেতনায় উজ্জীবিত বাঙালি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ধর্ষকেরা সাঁওতালদের ওপরেই হামলা করে। সর্বোপরি বলা যায়, জাকির তালুকদার তাঁর 'পণ্যায়নের ইতিকথা' ও 'স্বজাতি' গল্পদুটির মধ্যে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিম্নবর্গীয় করুণ বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। এখানে তারা বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিপরীতে নিম্নবর্গ হিসেবে বিবেচ্য।

নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় সাব-অলটার্ন স্টাডিজের তাত্ত্বিক পর্যালোচনাসহ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যসহ এই ধারায় আন্তনিও গ্রামসির প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মুক্তির তাড়নাজাত মার্কসীয় শ্রেণিচেতনাকে সাব-অল্টার্ন স্টাডিজে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয়। দার্শনিক কার্ল মার্কস নিম্নবর্গের শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, আর্থ-সামাজিক অচলায়তন বিনাশে বিপ্লবী শ্রেণিগুলোর সংগ্রাম আবশ্যক। অন্যভাবে বলা হয়, শ্রেণিচেতনার মাধ্যমে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সর্বহারাদের মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ।[২০] গল্পকার জাকির তালুকদার এরকম মার্কসীয় ভাবনার আলোকে নিম্নবর্গীয় নির্যাতিত বাস্তবতা থেকে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষের মুক্তির পথক্রম নির্মাণ করেছেন তাঁর

'টানাবাবা' গল্পে। আসলে জাকির তালুকদার মার্কসীয় দর্শন-পরিস্রুত বামপন্থি চেতনার একজন মানুষ।[২১] ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ওপরে নানা অত্যাচার-নির্যাতনের বাস্তবতাসহ তাঁর গল্পের অন্তঃস্রোতে প্রগতিশীল, সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসীয় চেতনাজাত বক্তব্য লক্ষ করা যায়। 'টানাবাবা' গল্পে শোষিত সাঁওতালদের শ্রেণিচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে যতীন সরেন অত্যন্ত শ্রেণিসচেতন একটি চরিত্র। বুর্জোয়া শাসকদের প্রতিভূ চেয়ারম্যানের দাসত্ব বরণ করে সে একসময় অনুভব করে, খাকি উর্দি পরে যেদিন থেকে সরকারি কর্মচারি হিসেবে দফাদার পদে যোগ দিয়েছে, সেদিন থেকে সাঁওতাল সমাজ থেকে সরে গিয়ে সে বাঙালি চেয়ারম্যানের গোলাম হয়েছে। তার মধ্যে শ্রেণিচেতনা তৈরির পর গোলামি অস্বীকার করে এক সময় গায়ের খাকি উর্দি টান দিয়ে পটাপট ছিঁড়ে অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে। এভাবে গল্পের কাহিনিতে নিম্নবর্গ সাঁওতালদের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় উপস্থাপনের মাধ্যমে গল্পকার মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রামের গুরুত্ব উপস্থাপন করেছেন। মার্কসবাদী শ্রেণিচেতনার সাথে একাত্ম হয়ে দার্শনিক আন্তনিও গ্রামসি নিম্নবর্গের মুক্তির জন্য সংঘবদ্ধ বিপ্লবের কথা স্বীকার করেছেন; তবে তাঁর মতে বিপ্লব সৃষ্টির বিষয়টি অতটা সরল নয়। কারণ নিম্নবর্গের বৃহত্তর সীমাবদ্ধতা হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা। নিম্নবর্গ যখন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের শিকার হয়ে উচ্চবর্গের অধীনে কুণ্ঠিত হয়, তখন তার বিদ্রোহীসত্তা থেকে শুরু করে চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি অবদমিত, খণ্ডিত ও নির্জীব থাকে।[২২] এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেনি বলে চেয়ারম্যানের নির্দেশে মহৌষধ হাতে পাওয়ার জন্য (সন্তানদানে অক্ষম মেয়ের সন্তান লাভের) যতীন সরেনকে চরকের বর্শির সাথে ঝুলে ঘুরতে হয়। অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল হওয়ায় যতীন সরেনের প্রতিবাদের ভাষা থাকে অবদমিত, ভীত ও শঙ্কিত। জাকির তালুকদার ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীর নির্জীব ও ভীত সত্তার পরিচয় নির্মাণ করে তাঁর 'আতশপাখি' গল্পটিকে তাৎপর্য মণ্ডিত করে তুলেছেন। ১৯৪৫ সালের তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস সন্নিবেশ করে রচিত গল্পটির মধ্যে সাঁওতাল কৃষকদের ওপরে বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক শোষণের বর্তমান বাস্তবতাসহ তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যায়। এই গল্পে নিম্নবর্গ বাঙালি ও সাঁওতালদের অভিন্ন বাস্তবতার বিপরীতে শোষকশ্রেণির প্রতিভূ হিসেবে মহাজন ও জোতদারদের পাওয়া যায়। গল্পের কাহিনিতে দেখা যায়– 'খাসজমিগুলো বেআইনীভাবে দখল করে রেখেছে জোতদারেরা। এগুলোর আসল হকদার ভূমিহীন ক্ষেত মজুরেরা।'[২৩] খাসজমি পুনরুদ্ধারের জন্য মার্কসবাদে দীক্ষিত এক যুবক শহর থেকে গ্রামে গিয়ে সাঁওতালপল্লি ও আশেপাশের ভাগচাষী কৃষকদের সমন্বিত করে আন্দোলন গড়ে তুলতে চায়। গল্পকথক সাঁওতাল পল্লির সিধুবুড়া অনুভব করে– এটা নাচোল, গোদাগাড়ি, ফরাদপুর ও সাঁওতাল পল্লির প্রত্যেক ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের প্রাণের কথা। তবে তাদের আন্দোলন-সংগ্রামের ফলাফল কী হতে পারে তেভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে তা মূল্যায়ন করতে চায়। তার অনুভবের আলোকে বিপ্লবী ছেলেটির পরিণতি (জোতদারের কারণে ছেলেটির লাশ মহানন্দার জলে ভাসে) পরিলক্ষিত হলেও ছেলেটির নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রেরণা নিয়ে সাঁওতাল কৃষক কার্তিক, কালিয়া, নিতাই, যোসেফসহ কৃষকেরা জেগে ওঠে। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সংগ্রামী চেতনা দানা বাঁধতে থাকে তাদের হৃদয়ে। যা দেখে–

> ঝিরঝির করে আশ্বাসের পরশ লাগল সিধুবুড়োর বুকে। আছে! আছে! এদের চোখেও আছে সেই পবিত্র আগুনের নাচানাচি। ছেলেটা, সেই জেদী বেপরোয়া সোনার মতো ছেলেটা মরার আগে তার বুকের আগুন জ্বালিয়ে রেখে গেছে ওদের বুকেও। নিজের ঘোলা চোখেও আগুনের সোনারঙ শিখা ঠিকই দেখতে পেয়েছে সিধুবুড়ো।[২৪]

নিম্নবর্গ কৃষকদের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সর্বহারার অধিকার প্রতিষ্ঠায় মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রামের সূত্র এগিয়ে নিয়ে গেছেন গল্পকার। মার্কসবাদী শ্রেণিচেতনার মাধ্যমেই সমন্বিত শক্তি ভূমিমালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেয়। তবে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে সিধুবুড়া প্রথম পর্যায়ে শঙ্কিত থাকে। ছেলেটি যখন গ্রামের নিম্নবর্গ মানুষকে একত্র হওয়ার কথা বলে তখন সিধুবুড়োর মধ্যে নির্জীবতা কাজ করে। গ্রামসির দেখানো নিম্নবর্গের অবদমিত বাস্তবতার সূত্র ধরেই সিধুবুড়োর ভাবনা সত্যি হয় এবং বুর্জোয়াদের হাতে ছেলেটির মৃত্যু ঘটে। তাই বলা যায়, উল্লিখিত গল্পসমূহে নিম্নবর্গ হিসেবে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী যখন শোষিত ও নির্যাতিত হতে থাকে তখন কিছু চরিত্র মার্কসবাদী শ্রেণিচেতনায় সচেতন হয়ে ওঠে।

চার

ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হারা করে উপনিবেশিত করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষণ ও অবদমন। মার্কসীয় ধারণামতে সমাজের সবকিছুর মূলে অর্থনীতি বিদ্যমান। তবে গ্রামসি দেখিয়েছেন, উচ্চবর্গ কর্তৃক নিম্নবর্গের ওপরে আধিপত্য বিস্তারের কৌশলটি কেবল ক্ষমতা ও অর্থনীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। বুর্জোয়া শক্তি নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও চিন্তাভাবনা চাপিয়ে দিয়ে নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক ও চৈতন্যগত রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে।[২৫] সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ চাপিয়ে শোষণের পথ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে গ্রামসি 'হেজিমনি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হেজিমনিক কৌশলে আবদ্ধ নিম্নবর্গ জাতি বুর্জোয়াদের দৃষ্টিতে নিজেদের দেখতে এবং নিজেকে তাদের অধস্তন মনে করতে শেখে। এই অধস্তনতার মধ্য দিয়ে এক সময় যখন নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পেশা সম্পর্কে হীনম্মন্যতাবোধ তৈরি হয়, তখন উপায় হারিয়ে অসহায় মানুষেরা নিজে থেকেই নিজেদের শাসন ও পরিচালনার ভার বুর্জোয়াদের ওপরে অর্পণ করে এবং শোষিত হতে প্রস্তুত থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে–

> The Concept of hegemoni is really a very simple one. It means political leadership based on the consent of the led, a consent which is secured by the diffusion and popularization of the world view of the rulling class.[২৬]

ঐতিহ্য রক্ষা বা অধিকার আদায়ের প্রয়োজনে মাঝে-মধ্যে শোষিত জনগোষ্ঠী প্রতিবাদী হয়ে উঠলেও হেজিমনিক কৌশলে পরাস্ত জাতি এই প্রতিবাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না। ফলে তারা অনেকটাই নির্জীব সত্তায় পর্যবসিত হয় এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতির আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। নব্য-ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষ শ্রেণিশত্রুকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা হারিয়ে নির্জীব সত্তায় পরিণত হয়ে যেভাবে 'নিম্নবর্গের ভেতরে নিম্নবর্গ' জীবন কাটাতে বাধ্য হয় তার পরিচয় পাওয়া যায় শাহীন আখতারের 'আস্তান' গল্পে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিন্দুবালার মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর একজন নারীর প্রান্তিক অবস্থান সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে, যেখানে তার

বিপরীতে সমাজের মূলধারায় বসবাসকারী নারীদের পাওয়া যায়। এই গল্পের মতো জাকির তালুকদারের 'কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই' গল্পে দুর্বল অর্থনীতি নিয়ে ক্ষমতার বাইরে থাকা নিম্নবর্গ চাকমা নারী ও চাকমা জনগোষ্ঠীর ওপরে চলা শাসন-শোষণসহ তাদের নির্জীব ও প্রতিবাদী সত্তার পরিচয় রয়েছে। গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে ১৯৯৬ সালের 'হিল উইমেন্স ফেডারেশনে'র সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমার অপহরণ বিষয়ক ঐতিহাসিক[২৭] বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে। গল্পে দেখা যায়, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কাপ্তাই বাঁধের মাধ্যমে প্রায় চুয়ান্ন হাজার একর চাষের জমি জলমগ্ন করে চল্লিশ হাজার পরিবারকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করা, পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'এক্সক্লুডেড এরিয়া'র অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, বাঙালিদের দিয়ে সম্পত্তি দখল এমনকি তাদের ওপরে সেনাবাহিনীর কঠোর নির্যাতন আর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে কল্পনা চাকমা। উচ্চবর্গ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে কল্পনা চাকমার প্রতিবাদী চেতনার সাথে গল্পকার মার্কসবাদী চেতনাসদৃশ ভাবনা জুড়ে দিয়ে গল্পের বর্ণনায় উল্লেখ করেন–

> রাজা জানে না, কল্পনা প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। নিজের সমস্ত শরীর-মনে বিষ মিশিয়ে রেখেছিল। পাহাড়-জঙ্গলে প্রতি মুহূর্তে তৈরি হয় এই বিষ। সবচেয়ে মারাত্মক বিষ নিপীড়িত আত্মার অভিশাপ। এই বিষ তার কাজ করবেই। দেরিতে হলেও।[২৮]

চাকমা সম্প্রদায়ের ওপরে সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের তথ্য বিদেশি তদন্ত দল যাচাই করতে গেলে জান্তা সদস্যরা তদন্ত রিপোর্টকে মিথ্যা ও ভুল বলে প্রমাণ করতে চায়। কল্পনা চাকমা তার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে; যে প্রতিবাদের সূত্র ধরে 'রাজার সেপাইরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। আর রাজা তাকে হাড়-মাংস-চুল-নখসহ গিলে খায়।'[২৯] মূলত চাকমারা ঐতিহ্য-সংস্কৃতিতে স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর হলেও নব্য-ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় হেজিমনিক কৌশলের কাছে পরাস্ত হয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হতে হচ্ছে। কখনও কখনও তাদের মধ্যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় পরিলক্ষিত হলেও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, মানসিক হীনম্মন্যতাবোধ ও হেজিমনির আবর্তে দিশেহারা হয়ে আন্দোলনের বীজকে তারা দানায় পরিণত করা থেকে ব্যর্থ হয়ে থাকে। তাদের হীনম্মন্যতাবোধ ও নির্জীবতার এমন পরিচয় পাওয়া যায় 'কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই' গল্পের শুরুতেই–

> রাঙরাঙা মানে কোলাহলের পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপত্যকা এখন নিথর। মানুষগুলো এখন চলাফেরা করে খুবই নিঃশব্দে। যেনো তারা ভয়ে ভয়ে থাকে তাদের পায়ের শব্দে অচেনা কোনো দৈত্যের ঘুম ভেঙে যাবে। মানুষগুলোর মুখে এমনভাবে লেপ্টে থাকে বিষাদ, মনে হয় তারা বিষাদ ও দুঃখের চিরস্থায়ী মুখোশ এঁটে রেখেছে মুখে। দেবশিশুর মতো বাচ্চাদের ঘুমপাড়ানোর সময় বাঘডাঁশ কিংবা ভূতের ভয় দেখানোর প্রয়োজন পড়ে না। জন্ম থেকে বড়োদের [...] জড়োসড়ো থাকতে দেখে এরাও ভয় পাওয়া শিখে গেছে।[৩০]

দেখা যায়, নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণ, পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের জাঁতাকলে চাকমা জাতিগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও নিজস্ব ভূমি হারিয়ে বর্তমান সময়ে অনেকটা নির্জীব ও শান্ত। তাদের ওপরে উচ্চবর্গের শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের চিত্র অভিন্নপ্রায় বাস্তবতা নিয়ে উঠে এসেছে জাকির তালুকদারের ছোটগল্পে, যেখানে বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির আওতায় তারা প্রকৃত সাব-অল্টার্ন বা 'নিম্নবর্গের ভিতরে নিম্নবর্গ' হিসেবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে আসছে। রাষ্ট্রশক্তির পাশাপাশি

সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর ওপরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগসহ যেভাবে আগ্রাসন চালিয়ে সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে, তা অনেকটা গ্রামসি নির্ধারিত হেজিমনিক কৌশলসদৃশ। সর্বোপরি জাকির তালুকদার তাঁর গল্পে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি বিনির্মাণের পাশাপাশি তাদের প্রান্তিক অবস্থানের পরিচয় সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, প্রান্তিক নিম্নবর্গ হিসেবে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক পরম্পরা হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশেও আর্থ-সামাজিকভাবে নির্যাতনের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। কিন্তু এর প্রতিবাদে তারা অনেকটাই নির্জীব ও ক্লান্ত।

পাঁচ

ঔপনিবেশিক পরম্পরা হয়ে আসা স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতে বিদ্যমান বুর্জোয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষদের নিম্নবর্গ হিসেবে অধঃপতিত ও নির্যাতিত হতে হচ্ছে। নব্বইয়ের দশকের কাল ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনপরবর্তী পুঁজিবাদের উত্থান, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি বিকাশের ফলে পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে চাকমা, মারমা, গারো, সাঁওতাল, কোচ, মান্দি প্রভৃতি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী মিশ্র জীবনধারা ও মিশ্র জীবনবোধে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের গল্পকার জাকির তালুকদার তাঁর গল্পে ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অতীত ঐতিহ্যসহ রূপান্তরমূলক সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও বর্তমান বাস্তবতা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

জাকির তালুকদার তাঁর কয়েকটি গল্পে দেখিয়েছেন যে, বাঙালি সমাজের মূল স্রোতের বাইরে থাকা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী মূলত নিম্নবর্গ বাঙালির তুলনায় প্রান্তিক, অবদমিত এবং দলিত। নিম্নবর্গ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর বিপরীতে উচ্চবর্গ হিসেবে অত্যাচারী ও শোষকের ভূমিকা নিয়েছে দালাল, মহাজন, ভূমির-মালিক, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ, মিশনারীসহ বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতিভূরা। বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজের মূল স্রোতে থাকা নিম্নবর্গ বাঙালি জনগোষ্ঠীও তাদের ওপরে আধিপত্যবাদী মনোভাব প্রয়োগ করে শোষণ-নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়েও ক্ষুদ্র-জাতির মানুষেরা উচ্চবর্গ দ্বারা শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বহুমুখী নির্যাতনের শিকার। উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রশক্তিই এই প্রান্তিক নিম্নবর্গ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করে নির্যাতনের পথ প্রশস্ত করে রেখেছে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে মার্কসীয় ভাবধারাপুষ্ট বিচ্ছিন্ন কিছু প্রতিবাদের চিত্র বিনির্মাণ করলেও বাস্তবতার পথ ধরে হাঁটতে গিয়ে গল্পকার বলিষ্ঠ কোনো প্রতিবাদের চিত্র উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি।

সাব-অল্টার্ন স্টাডিজের প্রবক্তাগণ মনে করেন– শাসন ও নিষ্পেষণের কবলে সহায়-সম্বলহীন নিরুপায় মানুষগুলো হেজিমনির শিকার হয়ে নিজেদের শোষণের পথকে অবারিত করে দেয় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভাষা-শক্তি হারিয়ে নির্জীব সত্তায় পরিণত হয়। জাকির তালুকদারের গল্পসমূহেও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাবে সহায়-সম্বলহীন ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর অসহায়ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। ক্ষমতা ও কেন্দ্রের বাইরে থাকা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী যদি কখনও

অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে প্রবৃত্ত হয় তখন স্বয়ং রাষ্ট্রযন্ত্রই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে তৎপর হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রনীতি, পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার জটিল ও কঠিন আবর্তে দিশেহারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে জড়িয়ে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নির্জীব ও নিঃশেষিত অবস্থা লক্ষ করা যায় জাকির তালুকদারের গল্পে। পরিশেষে বলা যায়, জাকির তালুকদার ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, তাদের ওপরে চালানো শোষণ-শাসন, স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহ্য হারানোর চিত্রসহ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বাস্তবচিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের যে অভীপ্সা উপস্থাপন করেছেন– তা উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা সমৃদ্ধ এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ধারায় গুরুত্ববহ।

তথ্যনির্দেশ

---

১ প্রশান্ত ত্রিপুরা, 'অস্তিত্বের জমিন যখন লুটেরাদের দখলে', *বহুজাতির বাংলাদেশ: স্বরূপ অন্বেষণ ও অস্বীকৃতির ইতিহাস*, সংবেদ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪২-৪৮

২ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (সম্পাদক: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়), আনন্দ প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২-৪

৩ অনুপ সাদি, *মার্কসবাদ*, ভাষা প্রকাশ, ঢাকা ২০১৬, পৃ. ৩৩

৪ মার্কস এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', *মার্কস এঙ্গেলস রচনা সংকলন* (১ম খণ্ড), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ২৬

৫ ভ. কেল্লে ও ম. কোভালসন, মার্ক*সীয় সমাজতত্ত্বের রূপরেখা*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫, পৃ. ২৪৭-২৫০

৬ ফখরুল চৌধুরী, 'উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি', *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ* (সম্পাদক: ফখরুল চৌধুরী), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৯-২০

৭ এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাইদ, 'অরিয়েন্টালিজম' (অনুবাদ: আমীনুর রহমান), পৃ. ১৪২-১৫১

৮ অদিতি ফাল্গুনী 'ব্রিংনি বিবাল', *ইমানুয়েলের গৃহপ্রবেশ*, উড়কি প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৭৩-৭৪

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১১ মুহম্মদ আবদুল জলিল, *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃ. ১-৯

১২ জাকির তালুকদার, ওয়েব সাইট: https://roar.media/bangla/main/art-culture/santal-people-and-their-culture, ২০১২ (Acceed: 13 June 2019)

১৩ শামীম নওরোজ, 'জাকির তালুকদারের ছোটগল্প: জীবনের আখ্যান', *আবহ* (সম্পাদক: নাজমুল হাসান), জাকির তালুকদার সংখ্যা, নাটোর, ২০১৩, পৃ. ৮১

১৪ জাকির তালুকদার, 'রাজার বাড়ি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।

১৬ প্রশান্ত ত্রিপুরা, "জাতির কী রূপ: বাঙালির 'নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ও 'হাজার বছরের ইতিহাস' পর্যালোচনা", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

১৭ জানুয়ারি ১৬, ২০২৩, *প্রথম আলো*, ওয়েব সাইট: https://www.prothomalo.com/bangladesh/1asxzyiajf

১৮ প্রাগুক্ত

১৯ জাকির তালুকদার, 'পণ্যায়নের ইতিকথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬

২০ ভ. কেল্লে ও ম. কোভালসন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭-২৫০

২১ শামীম নওরোজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

২২ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২৩ জাকির তালুকদার, 'আতশপাখি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

২৫ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

২৬ R. Bates Thomas, 'Gramsci and the Theory of Hegemony', *Journal of the History of Ideas,* Vol. 36, No. 2, 1975, p. 351

২৭ অবিভক্ত 'হিল উইমেন্স ফেডারেশনে'র সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমা নারী ও উপজাতিদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে কাজ করতেন। ১৯৯৬ সালের ১১ জুন মধ্যরাতে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার নিউ ল্যাইল্যাঘোনার নিজ বাড়ি থেকে তাকে অপহরণ করা হয়। এই নিয়ে তখন জাতীয় দৈনিকগুলোতে বেশ লেখালেখি হয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে। কল্পনা চাকমার অপহরণের বিষয়ে তার পরিবার থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্যকে অভিযুক্ত করে আসা হলেও গত ২৩ বছরেও কারো কোনো বিচার হয়নি এবং এই মামলার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি।

২৮ জাকির তালুকদার, 'কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬